কথকতা পাঠকতা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

ভারতে কথকতার, পাঠকতার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য প্রাচীন এবং কিছুটা অজ্ঞাত। ঋক্‌বেদের সময় থেকে বেদপাঠ এক অর্থে বেদগান। সামবেদে গানের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।[১] গানে গানে সুপ্রাচীন বেদের প্রতিটি শব্দ শ্রুতিরূপে পরিশীলিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৯০০ শতাব্দের মধ্যে আর্য-ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোত্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে; পাঞ্জাবে, হরিয়ানাতে, উত্তরপ্রদেশে, তিরহুতে, এবং কনৌজে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন পাঠক। রাহুল সাংকৃত্যায়নের দাদামশাই রামশরণ পাঠক ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। শেষ বয়সে তিনি বৈষ্ণব দীক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সৈনিক, পরে হলেন সম্পন্ন কৃষক; অর্থাৎ, নানান্ কারনে 'পাঠক' আর 'পাঠক' ছিলেন না।[২] এভাবে ক্রম ভঙ্গ হওয়ার জন্য পাঠকতার তথা কথকতার ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত কিংবা স্বল্পজ্ঞাত থেকে যায়।

আমাদের দেশে বেদপাঠের ঐতিহ্য এখনও আছে; তবে তা স্তিমিত। ঢাকা-বিক্রমপুরের বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত করুণাময় সরস্বতীকে, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, যাদবপুরের এক উদ্বাস্তু-পল্লীতে, এক বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, ঋক্‌বেদ পাঠ / গান করতে শুনেছিলাম। সামনে কোন বই-পুঁথি না রেখে গম্ভীর স্বরে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে করুণাময় প্রায় দু' ঘন্টা ধরে যজ্ঞাগ্নিসেবন করতে করতে বেদপাঠ করলেন, বেদগান করলেন। এখনও সে ঘটনা ভুলিনি। শ্রাদ্ধবাসর তাঁর বেদপাঠে গম্‌গম্ করতে থাকল। টালি দিয়ে ছাওয়া মূলীবাঁশের দেয়ালঘেরা সারি সারি ঘর; মাটিব মেঝে। চারদিকে দারিদ্র্যের, দুঃখের, বঞ্চনার চিহ্ন। এ সব যেন করুণাময়ের অসামান্য বেদগানে ক্ষণিকের জন্য অদৃশ্য হয়। তিনি কৃষ্ণকায়; তাঁর মাথার সামনের অংশ মুণ্ডিত, পেছনে দর্শনীয় বিপুল টিকি; চওড়া বুকে শুভ্র পৈতা আর রুদ্রাক্ষের মালা। তখন বুঝলাম, শুধু স্মৃতিতেই করুণাময়ের মতো ব্রাহ্মণরা শ্রুতিকে ধরে রেখেছেন; এজন্য তাঁদের বই-পুঁথির দরকার হয়নি।

যখন পুরাণসমূহ রচিত হ'ল, তখন বিশেষভাবে 'সাত্ত্বিক'-শ্রেনীর বৈষ্ণব পুরাণসমূহ পাঠ করা হ'ত, পাঠের সঙ্গে গানও করা হ'ত, কথায়, সুরে ব্যাখ্যা করা হ'ত। পশ্চিম ভারতে, দাক্ষিণাত্যে পুরাণ পাঠক কথকদের বলা হ'ত 'পৌরাণিক'। ধনীগৃহের শুদ্ধান্তঃপুরে পুরাণপাঠের সুযোগে 'পৌরাণিক'-এর লম্পটতা বর্ণিত হয়েছে কাশীপতি রচিত 'মুকুন্দানন্দভাণ' নামক কৌতূহলোদ্দীপক নাটকে।[৩] পৌরাণিক

তথা তথা পঠতি পুরাণং তথা তথা বক্ষ্যত্যর্থানিপি।
তথা তথা প্রেক্ষতে কিতব যথা যথা রজ্যন্তে বালবিধবাঃ॥

আমরা এখানে রামায়ণ-গানের কথা বলছি না ; তার সঙ্গে নৃত্য এবং অভিনয়ের সংযোগ ছিল। আমরা এখানে এটাই বলতে চাইছি যে, প্রধানতঃ পুরাণপাঠই ছিল কথকতা পাঠকতার ভিত্তি। বেদপাঠ ছিল মৌলিক পাঠ ; তার আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা পাঠের সময়ে প্রয়োজনীয় ছিল না। কিন্তু পুরাণপাঠ শুধু মূলের আবৃত্তি নয় ; আবৃত্তির পরে তার সহজ ভাষ্যও প্রয়োজনীয় হয়। ভাষ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় হয় গান। ভাষার সাহায্যে ভাষ্যকে নাটকীয় করে তুলতে হয়।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে এবং তার পরে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মের এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রসারের জন্য পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বলে, ব্রাহ্মণদের বহু উপনিবেশ গঠন করা হয়েছিল।[৪] বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এসেছিলেন কনৌজ, লাট, কর্ণাটক, এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য থেকে। এমন মনে করা যায় যে, এই ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণরাই বাঙ্গালা দেশে পাঠকতার / কথকতার সূত্রপাত করেন। কিন্তু তার পদ্ধতি অজ্ঞাত। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলেখতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ আছে।[৫] তা থেকে এমন মনে করা যায় যে, কর্ণাটক থেকে আগত সেন-বংশীয় রাজারা বেদপাঠের কর্ণাটিক-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত করেন।

পৌরাণিক কথকতার / পাঠকতার একটি বিশিষ্ট ধারাতে নিবদ্ধ ছিল ভাগবতপুরাণ পাঠ। এই পুরাণ পুরাণরূপেও ছিল বিশিষ্ট। পৌরাণিক রচনার যে প্রচলিত ধারা ছিল ভাগবতে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়নি। ভাগবতের ভাষা উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে কিছুটা আর্ষ ; এই আর্ষতা ভগবদগীতার ভাষাতেও দেখা যায়। ভাগবত প্রথমাবধি উচ্চশ্রেনীর কবিতা, এবং প্রথমাবধি বৈষ্ণবীয় ভক্তির আধার। এই পুরাণের দেবতা কৃষ্ণ অব্রাহ্মণ গোপাল ; তিনি কৃষ্ণকায়। তিনি বাঁশী বাজান, গোয়ালিনীদের সঙ্গে প্রেম করেন, এবং প্রয়োজন হ'লে অত্যাচারী নিষ্ঠুর দৈত্যদানবদের বধ করেন। তিনি তাঁর 'ভক্ত'কে রক্ষা করেন ; তাই তিনি ভক্তের 'ব্যক্তিগত' দেবতা। ভক্তের জাতি-বিচার করা হয় না। কৃষ্ণভজনে ভক্তির যে উচ্ছ্বাস থাকে, তা পাঠকের / কথকের ভাগবতপাঠেও প্রতিবিম্বিত হয়। বাঙ্গালা দেশে বল্লাল সেনের সময়ে ভাগবতপুরাণ জ্ঞাত ছিল।[৫ক] রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন দুর্বল, সমাজব্যবস্থা যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আধা-ফিউডাল সমাজে ব্যক্তির জীবনে যখন অনিশ্চয়তাই ধ্রুব, তখন ভক্তিতে, বিশেষ ভাবে যৌনতাগ্রস্ত কৃষ্ণভক্তিতে, রূঢ় বাস্তব অবস্থাকে কিছুটা ভুলে থাকা যেত। ভক্তি যদি গানে, বাদনে, নাটকীয় ব্যাখ্যানে একটি শিল্পিত স্বভাব অর্জন করে, তবে তো তো কথাই নেই।

পূর্বভারতে তথাকথিত 'হিন্দু' রাষ্ট্রব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতির কালে প্রতিভাবান কবি, এবং 'পদ্মাবতীচরণ চারণ চক্রবর্তী', জয়দেব রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ', যা ছিল গেয় কাব্য, যার 'অভিনয়' উদ্ভাবিত হয়। অসামান্য এই কাব্যের প্রথম শ্লোকেই অম্বর মেঘমেদুর, বনভূমি তমালশ্যাম, পটভূমি শ্যামময়। সুস্পষ্ট, সুন্দর, এবং নাটকীয় এই প্রেক্ষিত। পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবীয়

কথকতায় শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে গীতধ্বনি শোনা গেল, তারও অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন 'সম্ভবতঃ' জয়দেব। 'সম্ভবতঃ' বলছি এ কারণে যে, জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে, ১০৯০-১১১০ খ্রিস্টাব্দে, বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে সিদ্ধলগ্রামে, বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভট্ট ভবদেব একটি নারায়ণ-মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন; তাতে 'সঙ্গীতকেলি'-বিদগ্ধা একশত 'বিদ্যাধরী' অথবা দেবদাসী ছিলেন।[৬] লৌকিক কৃষ্ণকথা, এবং এই দেবদাসী-ঐতিহ্যদ্বারা জয়দেব প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অথচ, এমন ভাবার কারণ নেই যে, কথকতা/পাঠকতা প্রধানতঃ বৈষ্ণবীয় পুরাণপাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মিথিলাতে তার একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল। মৈথিল সঙ্গীতজ্ঞ লোচন লিখেছিলেন:[৭] [মূলাংশের অনুবাদ]

> বিদ্বান এবং প্রতিভাশালী রাজা ভবভূতি এমন কয়েকটি কাব্য রচনা করেন যা ছিল 'পুরাণপ্রতিম', অর্থাৎ পুরাণের মতো। তাঁর রচনাবলী কথকতারপদ্ধতি অনুসারে রাজসভায় পাঠ করা হ'ত; এই বিশেষ কথকতায় খ্যাতি অর্জন করেন কায়স্থ গায়ক সুমতি, এবং তাঁর পৌত্র জয়ত। জয়ত কবি বিদ্যাপতির কাছেও গীতরচনার পদ্ধতি শিখেছিলেন…জয়তের ছেলে কৃষ্ণও ভালো গায়ক ছিলেন। তাঁদের পরে খুব বড় গায়ক এবং কথকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 'অগ্নিতুল্য' দেহকান্তিসম্পন্ন হরিহর মল্লিক। হরিহর মল্লিকের তিন পৌত্র রামান্তা, লছিরাখব, এবং টীকা। তাঁরা 'দেশী' গীতের উত্তম গায়ক ছিলেন।

লোচনের আবির্ভাবকাল ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মিথিলাতে কথকতার যে ধারা ছিল, তার সঙ্গে রাগাশ্রিত সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ কথক জয়ত যখন বিদ্যাপতির কাছে গীতরচনা শিখলেন, তখন থেকে মৈথিল কথকতায় বৈষ্ণব প্রভাব সঞ্চারিত হয়।

যাতে কথনকালে কথক/পাঠক অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা না করেন, কথার খেই হারিয়ে না ফেলেন, এজন্য কথকদের প্রয়োজনে কথার 'আদর্শ' রচিত হয়। এরকম 'আদর্শ' রচনা ছিল জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত 'বর্ণরত্নাকর'।[৮] 'মৈথিল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থই প্রাচীনতম; তার রচনাকাল চতুর্দশ শতকের শেষভাগ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভেবেছেন যে, জ্যোতিরীশ্বর কথকদের জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেননি; এটি ছিল, তাঁর ভাষায়, 'unquestionably a book of poetical conventions and of set formulae…'।[৯] কিন্তু কবিপ্রসিদ্ধির অথবা কাব্যরীতির দৃষ্টান্ত এবং ভাষ্য-মূলক অন্য যে সব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল, তাদের

সঙ্গে 'বর্ণরত্নাকর'-এর কোনই মিল নেই। 'বর্ণরত্নাকর'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে 'নগরবর্ণন' (পৃ. ১-২), 'স্থানবর্ণন' (পৃ. ৮-১০), 'ঋষ্যাশ্রম বর্ণনা' (পৃ. ৪৩), 'মল্লযুদ্ধ বর্ণনা' (পৃ. ৪৫-৪৬), 'দেশ বর্ণনা' (পৃ. ৬১-৬২)। এ ধরনের বিশেষ বর্ণনা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধিতে স্থান পায় না। বাঙ্গালি কথকরাও এ ধরনের বর্ণনার ধারা পরে অবলম্বন করেন। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে মৈথিল কথকতার ঐতিহ্যও বাঙ্গালা দেশে আসে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রথমে ভক্তির বিষয়টি খুব বেশি লোকের জানা ছিল না। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন : ১০

গীতা ভাগবত যে যে জনে পড়য়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

এই অবস্থার অবসান হ'ল চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। যখন বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতিতে ভক্তির গুরুত্ব আসামান্য হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবীয় কথকতার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রূপ গোস্বামীর সভায় ভট্ট রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন। কৃষ্ণদাসের ভাষায়, ১১

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রুকম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ ঝরে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

ভাগবতপাঠে রাগরাগিনীর তরঙ্গবিভ্রম সম্ভবতঃ প্রথমে মিথিলাতে, পরে মথুরা বৃন্দাবনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন থেকে ভাগবতী রাগতরঙ্গ আসে বঙ্গে এবং কলিঙ্গে ; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখনও হিন্দীতে রচিত কোন কোন কৃষ্ণভজনে একই কালে বিভিন্ন রাগরাগিনীর রূপায়ন অতিশয় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ওড়িষ্যার মুসলমান-বৈষ্ণবকবি সালবেগ-রচিত বৈষ্ণবীয় ভজনেও এই ব্যাপার দেখা যায়।

যাঁরা ভাগবত পুরাণপাঠের বৃন্দাবনী রীতির সঙ্গে বৃন্দাবনে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য।১২ সুদর্শন এবং সুপণ্ডিত শ্রীনিবাসের জীবিকা ছিল ভাগবতপাঠ। সেই পাঠ শুনে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র আনন্দে নেচেছিলেন।১৩ শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তাঁর কোন কোন পদে যে চিত্রলক্ষণ দেখা যায়, সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাতে ভাগবতপাঠের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। যখন তিনি লেখেন,১৪

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঐে
তরই এ ভবসিন্ধু রে॥

তখন ধরে নেওয়া যায় যে, অন্ততঃ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এ গানের একটি ভূমিকাও গায়ককে করে নিতে হ'ত। কথকতা/পাঠকতার মাধ্যমে বাঙ্গালা দেশে এল নতুন নতুন গান, যা প্রচলিত মঙ্গলকাব্য গীতিকা থেকে ভিন্ন ছিল। এখন এরূপ নির্ণয় করা হয়েছে যে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পরে 'চৈতন্যভাগবত' রূপে আখ্যাত) প্রথমাবধি ছিল গেয় কাব্য১৫; এই কাব্যের গায়নে নিশ্চিতভাবেই ভাগবতপাঠের কোনো প্রচলিত রীতি অবলম্বিত হ'ত। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থপাঠ বৈষ্ণবদের ধর্মীয়কৃত্য হয়ে ওঠে। এই পাঠ শুধু আবৃত্তি ছিল না, মূলের ব্যাখ্যাতে গানেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পদাবলীকীর্তনের প্রাণবস্তুস্বরূপ 'আখর' কথকতা থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে।১৬

শ্রীনিবাস আচার্যের সমকালীন, এবং সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতকের কোন কথক/পাঠকের নাম জানি না। অথচ কথকতা/পাঠকতা যে সে সময়ে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রাধবল্লভ চক্রবর্তী ভাগবত অনুসারে রাসলীলার পদাবলী রচনা করেন।১৭ দাস্যভক্তিমূলক ভাগবত কাহিনী রচিত হয়। ১৮ ষোড়শ শতকের শেষদিকে রাঢ়ে জাতিভেদ বিরোধী সুপণ্ডিত এক বৈষ্ণব গুরু ছিলেন জয়গোপাল দাস; অব্রাহ্মণ এই বৈষ্ণবগুরুকে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুরা সমাজ থেকে বার করে দিয়েছিলেন।১৯ তাঁর শিষ্য ঘনশ্যাম দাস একটি কাব্য রচনা করেন; কাব্যটির আখ্যা 'হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত'।২০ সমকালীন কবি বংশীদাস 'শ্রীভাগবতানুসারেণ' বেশ কিছু গান লিখেছিলে।২১

ঊনিশ শতকের শুরুতে কথকতা/পাঠকতা বাঙ্গালি-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ ছিল। ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল লিখেছিলেন: ২২

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
ভবানীভবের গান মালসী মায়ুর
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
গড়াহাটী রাণীহাটি বিরহ মাথুর

কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর
কথকতা তরজাতে শাড়িতে (সারিতে) প্রচুর
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপুর
বাঙ্গালার নবগান নূতন ঝুমুর ॥

জয়নারায়ণ শুধু যে 'চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অষ্কুর'কে গানের তালিকায় রেখেছেন তাই নয় ; তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, যে শ্রবণসুখকর 'তালফেরা' কবি, এবং রাগমার্গাশ্রিত 'পশতো' গানে শোনা যেত, তা "কথকতা তরজাতে শাড়িতে (সারীতে) প্রচুর"। লক্ষণীয়, তিনি টপ্পা এবং আখড়াই গানের উল্লেখ করেননি। তাঁর তালিকা থেকে এটা বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের শুরুতে বাঙ্গালার সাঙ্গীতিক কৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের গান, এবং 'সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর,' তরজা, সারি, জারি গান, 'নূতন ঝুমুর', অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি সমানভাবেই আদরণীয় ছিল, এবং লৌকিক সংস্কৃতি এবং শিষ্টবর্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে সীমারেখা তেমন স্পষ্ট ছিল না।

'করুণানিধান বিলাস'-এর চার দশক পরে রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে কথকতার বিবরণে এই প্রাচীন চারুশিল্পের অবনতি প্রকটিত হয়েছে।[২৩] মাল্যভূষিত কথকঠাকুর যেন 'বৃষোৎসর্গের ষাঁড়' 'বলিদানের মহিষ'। তিনি 'কাশিরাম খুড়ো'-র মহাভারত অবলম্বনে 'রসিকতার একশেষ কচ্চেন'। হুতোম লিখেছেন :

কথকতা পেসাটা ভাল-দিব্য জলখাবার দিব্য
হাতপাখার বাতাস ; কেবল মধ্যে মধ্যে
আহার বিহারে আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে
হয়, সেইটেই মহান কষ্ট।

হুতোম আদর্শ কথক হিসেবে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন এবং শ্রীধর কথকের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :[২৪]

বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না
গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দুআঁখর
পাঠ কীর্ত্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্ত
করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে
বসে ব্যাসবধ করেন।

এই বিবরণ থেকে মনে হয়, হুতোমের কালে শিষ্টবর্গীয় নাগরিক বাঙ্গালিদের উপরে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব আর আগের মতো গভীর ছিল না। এ কারণেই কথক/পাঠকরা নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের গলা

সাধতে হ'ত ; সাধাগলায় ভাল গান না গাইতে পারলে তাঁরা সমাদৃত হতেন না। কোন কোন কথক/পাঠকের নৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে হুতোম যে ইঙ্গিত করেছেন, তা তো পূর্বে উল্লিখিত 'মুকুন্দানন্দ ভাণ'-তে আরও বেশি স্পষ্ট।

গদাধর শিরোমণি এবং রামধন তর্কবাগীশ সম্পর্কে অরুণ নাগ কিছু তথ্য দিয়েছেন।[২৫] গদাধর শিরোমণির আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে তাঁর নিবাস ছিল। বর্ধমানের রাজবাড়িতে ভাগবতপাঠ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কথকতায় 'সাট' [রীতি] রাঢ়ের কথকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রামধন তর্কবাগীশ ছিলেন কুশদহের পন্ডিত রামরাম তর্কালঙ্কারের পৌত্র। নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল তাঁর ; তাঁকে বলা হ'ত 'কথক শিরোমণি'। অরুণ নাগের মতে গদাধর ও রামধন ছিলেন 'উনিশ শতকে প্রচলিত কথকতা রীতির প্রবর্তক'।[২৬] কিন্তু তখন অন্যান্য ধরনের রীতিও ছিল বলে মনে হয়। বিখ্যাত টপ্পা-রচয়িতা শ্রীধর কথককে গদাধর-রামধনের 'সাট'-এর বাইরে থেকে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ কথকতা তাঁর পেশা হ'লেও প্রধানতঃ উচ্চমানের টপ্পা রচনা করেই তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হুতোম-প্যাঁচা লিখেছেন : "শ্রীধর অল্প বয়সেই বিলক্ষণ খ্যাত হন"।[২৭] এমনও ভাবা যায় যে শ্রীধর তাঁর কথকতায় টপ্পা গানে রাগরাগিনীর তরঙ্গ বিভ্রম সৃষ্টি করতেন। তা রাঢ়-অঞ্চলের 'সাট'-এ শোনা যেত কী না জানি না। এখানে উল্লেখ্য, হাওড়ার কালীপদ পাঠক উচ্চস্তরের টপ্পা-গায়করূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, পাঠকরূপে নয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হুগলি-চন্দননগরে, নবদ্বীপে, বহরমপুরে, খরদহ-পানিহাটিতে একাধিক কথক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

অক্ষয় অধিকারী (চন্দননগর)[২৮]
গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর)[২৯]
উদ্ধবচন্দ্র চূড়ামণি (হুগলি)[৩০]
কালীচরণ ভট্টাচার্য (বহরমপুর ; শ্রীধর কথকের কথকতাশিক্ষাগুরু)[৩১]
ধরনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়[৩২]
জয়গোপাল গোস্বামী (নবদ্বীপ)[৩৩]
কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন[৩৪]
প্রাণকিশোর গোস্বামী (খড়দহ)[৩৫]
ভুবনমোহন রায়চৌধুরী[৩৬]
কৃষ্ণকান্ত পাঠক (দক্ষিণ বিক্রমপুর)[৩৭]

দীনেশচন্দ্র সেন একটি কথকতাশিক্ষণের পুঁথিতে কতগুলো বিষয়ের বিবরণ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দেখতে পেয়েছিলেন।[৩৮] এই বিষয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলো পূর্বোক্ত 'বর্ণরত্নাকর'-গ্রন্থেও দেখা যায় ; বিষয়গুলো হ'ল :

নগর	মেঘলা দিন	রাম	সরস্বতী
মধ্যাহ্ন	রমনীর রূপ	লক্ষ্মণ	লক্ষ্মী
প্রাতঃকাল	নায়দঋষি	শিব	বনভূমি
রজনী	বিষ্ণু	কালী	যুদ্ধ
			ভগবতী।

মেঘলা দিন, বনভূমি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রথম শ্লোকটিকে মনে করিয়ে দেয়। দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন :৩৯

> There are formulae which every *Kathaka* has to get by heart, set passages describing not only Siva, Laksmi, Visnu, Krisna and other deities, but also describing a town, a battlefield, morning, noon and night, and many other subjects which incidentally occur in the course of the narration of a story. These set passages are composed in Sanskritic Bengali with a remarkable jingle of cousonances the effect of which is quite extraordinary.

দীনেশ চন্দ্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তাই বলি, মনে হয় পাঠকতা যেমন ভারতচন্দ্রের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমন ভারতচন্দ্র নিজেও পাঠকতা/কথকতার দ্বারা প্রভাবিত হন। 'চণ্ডীনাটক'-এ মহিষাসুরের বিবরণে কথকতার লক্ষণ খুব স্পষ্ট :৪০

[মহিষাসুরের আগমন] [মহিষাসুর 'বাজারের হিন্দী'তে কথা বলেন]

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনি কৃত জগতী কর্ণপূরাব রোধ ঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিল চলদ চলাত্যন্ত বিভ্রান্তলোক ঃ
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছ খাতোচ্ছল দু দধিজল প্লাবিত স্বর্গমর্ত্যো
খর্ খর্ খর্ খোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষ ঃ কামরূপো বিরূপ ॥ ইত্যাদি

[খুরের খট্ মট্ খট্ মট্ শব্দ করে আসছে মহিষাসুর। এই শব্দে পৃথিবীর মানুষের কাণে তালা লাগে। তার নাকের নিঃশ্বাস ফোঁ ফোঁ শব্দে নির্গত হচ্ছে ; তাতে পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। তার লেজের সপ্ সপ্ সপ্ আঘাতে সাগরের জল উপচে পড়ে স্বর্গমর্ত প্লাবিত করে। খর্ খর্ খর্ এইরূপ বিকট শব্দ করে বিশ্রী, অথচ ইচ্ছা অনুসারে রূপধারী, মহিষ প্রবেশ করছে।]

ভাগবতের কথকতা / পাঠকতা কিছুটা ভিন্ন ছিল ; তার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, এবং তাতে কথা এবং গান, এবং ভক্তির প্রকাশ সর্বত্র এবং সর্বদা

বাঁধাধরা পদ্ধতি ধরে থাকেনি। কথকতায় ঠিক কী ধরনের গান উনিশ শতকে গাওয়া হ'ত, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। হুতোম পদাবলী গানের কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁরও আগে জয়নারায়ণ ঘোষাল উচ্চাঙ্গের 'তালফেরা'-র আঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। শ্রীধর যে টপ্পা গাইতেন, তাও নিশ্চিত। কিন্তু আরও অনেক রকমের গান ছিল। বিশেষভাবে ছিল মধুসূদন কিন্নর-উদ্ভাবিত ঢপ-কীর্তন, যাতে বাউল, পদাবলী কীর্তন, এবং রাগসঙ্গীত মিশ্রিত হয়।[৪১] কোন কোন ঢপের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন কথিত 'jingle of consonances'-এর কিছু মিলও আছে। দাশরথী রায়ের পাঁচালীর প্রভাবও কথকতায় পড়েছে, এমনও বলা যায়; আবার এমনও বলা যায় যে, দাশরথী-পাঁচালীর গদ্যাংশে সুস্পষ্ট ভাবে কথকতার প্রভাব দৃশ্যমান।[৪২]

উনিশ শতকে কথকতা / পাঠকতার দুটি বিবরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিবরণ দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন।[৪৩] তখন তিনি গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। টাইফয়েড-জ্বরে পুত্রের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন গগন বাবুদের মানসিক শান্তি বিধানের জন্য দীনেশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির কথকতার ব্যবস্থা করেন। ক্ষেত্রনাথ দেখতে ভাল ছিলেন না; তাঁর গায়ের রঙ কালো; মাথায় বিশাল টাক্; বিপুল ভুঁড়ি। "কিন্তু", দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "কথা বলিবার ইহাঁর আশ্চর্য শক্তি ছিল, প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল।" সন্ধ্যায় হলঘরে পাঠ হত। পালা ছিল "ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ" ইত্যাদি। "তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত-সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সামনে উপস্থিত করিতেন..."। ক্ষেত্রনাথ পাঠ করতেন আর গগনেন্দ্রনাথ লুকিয়ে তাঁর চেহারা আর ভঙ্গীগুলো আঁকতেন। প্রচুর উপহার পেয়ে ক্ষেত্রনাথের "ভুঁড়ি বাড়িয়া গেল, চেহারার চিকনাই হইল, কালো রংটা শ্যামাভ হইল"। গগনবাবুদের বাড়িতে পাণিহাটি, বেনেটোলা, এবং শ্যামবাজার থেকে কথকরা এসে কথকতা করেছেন; কিন্তু তাঁরা ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না। এমন যে ক্ষেত্রনাথের কথকতা, তাও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আমন্ত্রিত পাবনার শিবু কর্তনীয়ার গোষ্ঠলীলায় অসামান্য কীর্তনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

দীনেশচন্দ্রের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক্ষেত্রনাথ কথাই বেশি কইতেন; তাঁর গান গাওয়ার উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় কথকতার বিশদ বিবরণে কথকের গান গাওয়ার বিষয়টি বেশ গুরুত্বসম্পন্ন। এই বিবরণ দিয়েছেন অনুরূপা দেবী, তাঁর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে।[৪৪] তাতে দেখা যায় যে এক বৈষ্ণব জমিদার 'গোপীকিশোর'-এর মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক সেই মন্দিরে পৌরহিত্য এবং কথকতা করতেন। এই অধ্যাপকের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রধান ছাত্র, সুদর্শন, লাজুক, স্বল্পভাষী, এবং দার্শনিক অম্বরনাথ নিয়ম অনুসারে কথকতা করতে এলেন। তিনি কথাও বলেন কম, গানও জানেন না। তাই তাঁর কথকতা জমল না। তাঁর জায়গায়

কথকতা করলেন তাঁর সহপাঠী আদ্যনাথ। আদ্যনাথের দুর্দান্ত কথকতার বিবরণ এইরূপ :

তাঁর কপালে চন্দনতিলক ; বুকে টগর ফুলের মালা।
তাঁর কণ্ঠস্বর কখন পঞ্চমে, কখন সপ্তমে।
তাঁর গানের সুর কখন ভৈরবী, কখন বেহাগ, কখন ললিত।
তাঁর কথকতার বিষয় 'অভিমন্যু বধ'।
তাঁর ভাষা 'করুণরসসিক্ত' ; তা ছন্দে, তালে যেন 'নৃত্যনিপুণা নর্ত্তকী'।
তাঁর ভাষা শ্রোতাদের কাঁদায়, কখনও বা হাসায়।
শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া কথকঠাকুরে কখনই দেখা যায় না।
তাঁর ভক্তিরসের গান তাল-লয়যুক্ত, 'সুমিষ্ট'।
শ্রোতাদের মনে হয়, 'কী সুন্দর ! কী সুন্দর !' তাঁরা 'ভাবমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত'।
পাঠশেষে 'ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ' বলে পাঠকের শান্তিজল বিরতণ।

কথকতা শ্রবণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এখানে সংক্ষেপে লিখি। যে বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে আমার জন্ম হয়, তার কর্তাব্যক্তিগণ 'পাঠক'-রূপে সুপরিচিত ছিলেন। আমাদের বাড়ির চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি, নবন্যায়, এবং ব্যাকরণ পড়ান হ'ত। আমার এক জ্যেঠামশাই ছিলেন পেশাদার পাঠক। সারা বৎসর ধরেই তিনি বিভিন্ন জেলায় পাঠকতা করতেন ; সুযোগে আমাদের সবার বাড়িতেও তাঁর পাঠের আসর বসত। এরকম একটি আসরের স্মৃতি সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও কিছুটা স্পষ্ট। যতোদূর মনে পড়ে, তাঁর পাঠকতা হয়েছিল আমাদের বাড়ির অন্দরমহলে বিশাল উঠানে সামিয়ানা খাটিয়ে। সময়টা ছিল বৈশাখের শেষ। বিষয়বস্তু ছিল 'কংসবধ'। হ্যাজাক্-লণ্ঠন আনা হয়েছিল আমাদের গ্রামের বাজার থেকে। চার-পাঁচটি জোড়া চৌকিতে স্থাপিত হয়েছে ব্যাসাসন ; যিনি পাঠক, তিনিই সামগ্রিকভাবে বেদব্যাস। এসেছে একটি বড় হারমোনিয়াম, একটি বেহালা, এক জোড়া খঞ্জনী, একটি খোল, এক জোড়া বায়া-তবলা। ব্যাসাসনে সাদা ফুল, এবং লাল শালু মোড়া ভাগবতের পুঁথি। আসরে তিলধারণের স্থান নেই। জ্যেঠামশাই পাঠ করতে এলেন। সৌম্যকান্তি দীর্ঘাঙ্গ স্বাস্থ্যবান জ্যেঠামশাইয়ের কবাট বক্ষ রজনীগন্ধার মতো শুভ্র চাদরে আবৃত। তিনি মাল্যবান।

পাঠ শুরু করলেন তিনি। তাঁর কথা, এবং কথার পারম্পর্য মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর সাধা গলায় প্রায় অপার্থিব স্বর এখনও যেন শুনি। তাঁর শ্লোকের উচ্চারণে কী মাধুরী ! সুশ্রাব্য সাধু মাতৃভাষায় তাঁর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কী সুন্দর। ব্যাখ্যাকালে কখনও করলেন তিনি নাটকীয় আবৃত্তি, কখনও গাইলেন গান। গানের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, টপ্পা, দাশরথী রায়ের গান ছিল, মনে পড়ে। কখনও তাঁর তারার মতো উজ্জ্বল চোখে বাষ্পাভাস ; কখনও কিছুটা অঙ্গভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিসহ এমন রসিকতা করলেন যে, প্রায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত বৌ-ঝিরা হেসে কুটি কুটি। বড় হয়ে জেনেছিলাম,

জেঠামশাই প্রণয় বিরহ প্রসঙ্গে স্বরতরঙ্গ ভঙ্গিমার শিল্পিত প্রয়োগে প্রায়শঃ বাঙ্গালা টপ্পাই গাইতেন। পুরাতন বাঙ্গালা গানের বেশ বড় শিল্পী ছিলেন তিনি। পরে তিনি অন্যত্র চলে যান পেশার তাগিদে। খুব বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। এই পাঠকের নাম হরকান্ত পাঠক।(৪৪ক) তিনি পাঠক এবং গায়ক।

প্রথম থেকেই কথকতা / পাঠকতার সঙ্গে অভিজাত সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ লক্ষণীয়। কথকতার ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃত পৌরাণিকতা। বৈষ্ণবরা কথকতাকে জনসাধারণের শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু তাতেও আভিজাত্য ছিল। কথকতা ঠিক্ কবি, হাফ্-আখড়াই এবং তরজা গানের লৌকিক স্তরে নেমে আসেনি। হুতোমের ভাষায় 'রসিকতার একশেষ' করে 'ব্যাসবধ' করে যে সব কথকরা নিম্নস্তরে আসেন, তাঁদের দিনও ফুরিয়ে আসছিল কারণ, ক্রমশঃ পৌরাণিক মানসিকতাই ক্রম-বর্ধমান আধুনিক নাগরিক পরিমণ্ডলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

এক সময়ে প্রধানতঃ গ্রামীণ, নাগরিক জমিদার এবং ব্যবসায়ীগণ কথক পাঠক ঠাকুরদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিলেন। পদ্মানদীর তীরে কালীপাড়া (কাউলীপাড়াও বলা হয়) নামে একটি বড় গ্রাম ছিল।(৪৪খ) পদ্মার ভাঙনে সে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়। আমাদের পাঠক-পরিবার সে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে নতুন বাসস্থানের সন্ধান করতে থাকেন। আমার পিতামহ মালখানগর গ্রামের বসুঠাকুর জমিদারদের বাড়িতে একদা ভাগবতপাঠ করেছিলেন, এবং পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ যে ষাট্-সত্তর কাঠা নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন, তাতেই নির্মিত হয়েছিল আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের নতুন বাসস্থান।

সব পাঠক / কথক এমন ভাগ্যবান ছিলেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সৃষ্ট কথক চরিত্র 'পথের পাঁচালী'র হরিহর ভাল খেতে-পরতে পাননি। জঙ্গলাবৃত গ্রামের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আচ্ছন্ন করেছে। হরিহরের কোনো জমিদার কিংবা ব্যবসায়ী পৃষ্ঠপোষক তো ছিল না। ১৯৪৬-৪৭-এ কুচবিহার শহরে এক নিরন্ন ভ্রাম্যমান কথকঠাকুরকে দেখেছিলাম। তিনি সুদূর ফরিদপুর থেকে এসেছিলেন; পরনে মলিন বস্ত্র; সামান্য থলেতে তাঁর পুঁথি। কলেজের এক দয়ালু অধ্যাপকের গৃহে তাঁর কথকতা হ'ল। ব্যর্থ হ'ল সেই কথকতা কারণ, পেটে ভাত না থাকার জন্য গলায় তাঁর সুর ছিল না।

সাধারণ শ্রোতারাও সর্বদা কথকতার এবং রামায়ণ-পাঠের অর্থ বুঝত না অনেক সময়ে। লেখা হয়েছে ৪৫ :

> রামায়ণ শুনিতে শুনিতে করিম চাচা ভেউ ভেউ
> করিয়া কাঁদিয়া উঠিল···একজন বলিল তুই
> কি বুঝিলি যে কাঁদিচস? করিম চাচা কহিল···
> আমার একটা বোকা ছাগল ছিল, তার দাড়ী
> যেমন সুন্দর তেমন দাড়ী নাড়াও ছিল সুন্দর।

আহা বেচারী আজ একমাস হইল স্বর্গে গেছে।
এই ঠাকুর মহাশয়ের দাড়ী নাড়া দেখিয়া আমার
সেই বোকা ছাগলটাকে মনে পড়িয়া দুঃখ হচ্ছে
তাই কাঁদছি।

গল্পটি হাস্যরসমিশ্রিত করুণরসের অতি বিরল একটি নিদর্শন। কলকাতার টালা পার্কে, কলেজ স্কোয়ারে, এবং অন্যান্য বড় পার্কে কিছুকাল আগেও কথকতা শোনা যেত; তার একটি সুন্দর বিবরণ[৪৬] ঃ

কপালে চন্দন, গলায় চাদর কোন মাঝবয়সী বা
প্রৌঢ় সামনে ছোট ভাঁজ করা টেবিলে ধর্মগ্রন্থ
থেকে পাঠ করেছেন। তাঁর গলায় শব্দ হয়ে উঠেছে
ছবি···বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পার্কের গুমটি-
গুলিতেই বসত এই পাঠের আসর। শ্রোতাদের
মধ্যেই কেউ বাড়ি থেকে বয়ে আনতেন টেবিল,
আসন। কেউ আনতেন ঠাকুর দেবতার ছবি, আর
যৎসামান্য বাসনকোসন। সেই ছবি এখন শুধুই
স্মৃতি···পাততাড়ি গুটিয়েছেন কথক ঠাকুরেরা।

তাদের পাততাড়ি গুটাবার কারণ বোধ হয় এই যে, কলকাতায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠে বিবিধ 'আশ্রম' এখন সংগঠিত কথকতা / পাঠকতার কেন্দ্রস্থলরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে কথকতার বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, রামকৃষ্ণলীলা, বিবেকানন্দের প্রতিভা। এসব স্থানে শ্রোতাদের জন্য বসার, শোনার, প্রসাদ পাবার ভাল ব্যবস্থা আছে। তাই কে আর ধূলিমলিন পার্কের ঘরে বসে নিরন্ন দুর্বল বিষণ্ণ কথকের সুরহীন কথকতা শুনতে চাইবে?

কথকতা পাঠকতা

।। প্রমাণ এবং প্রয়োজনানুসারে মন্তব্য ।।

১. রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'তত্ত্বমসি' (কলিকাতা, পাণ্ডুলিপি ১৩৯৮) পৃ. ১৮-৩০
২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 'আমার জীবন-যাত্রা', প্রথম খণ্ড, অনুবাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী এবং অন্যান্য, (কলিকাতা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি, ১৯৯৩), পৃ. ৪০০-৪০৬
৩. Pondita Durgaprasad and Kasinath Pandurang Parab ed. *The Mukundananda Bhana of Kasipati*, Third ed. (Bombay, Nirnaysagar Press, 1926) পৃ. ২৩-২৫

মূল প্রাকৃত শ্লোক : তহ তহ পঢ়ই পুরাণং তহতহ বক্‌খাইং অথ্যোবি/তহ তহ পেক্‌খই কিদ বো জহ জহ রজ্জন্দি বালবিহবাও ব্যাভিচারী-পৌরাণিক বিষয়ক শ্লোক : নারায়ণরাম আচার্য, 'সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্' (বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৫২), পৃ. ৪৪ : 'পৌরাণিক নিন্দা'

৪. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal.* (Calcutta, Indian Studies Past and Present, 1967).

৫. S K. Maiti, R. R. Mukherjee, *Corpus* of *Bengal Inscriptions.* (Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967) PP. 333-336, *Sloka*-19

৫ক. Bhavatosh Bhattacharya ed. *The Danasagara* of *Vallalasena*, Fac. I, (Calcutta, Asiatic Society, 1955), PP. 6-7.

৬. *Corpus of Bengal Inscriptions*, পূর্বে উক্ত, P. 353, *Sloka*-30

৭. রাজেশ্বর মিত্র সম্পাদিত, 'লোচন শর্মা বিরচিত রাগতরঙ্গিনী' (কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯১), পৃ. ৫৬-৫৮

৮. Suniti Kumar Chatterjee Babna Misra ed. *Varnaratnakara of Iyotirisvara Kavisekhara* (Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1940)

৯. উপরে উক্ত, introduction, P. XXIII.

১০. বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' (কলিকাতা, সুচারুকান্তি ঘোষ, ১৩৫৬), পৃ. ১২

১১. শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (কালনা, গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০) অন্ত্যলীলা, পৃ. ৭৯০

১২. দ্রষ্টব্য : জীমূতবাহন রায়, 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' (বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা ১৯৮৪), পৃ. ২৯-২১৫

১৩. নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তিরত্নাকর', নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, (কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, ১৯৬০) পৃ. ৪০১। গোবিন্দদাস তাঁর গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের বর্ণনা করে লিখেছেন :

জয়জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম
দীনহীন তারণ প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥
কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।

প্রেমনাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছন বরতনু সাজে ॥ ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদাবলী' (কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১) 'শ্রীনিবাস বন্দনা', পৃ. ৫৭৪

১৪. 'বৈষ্ণব পদাবলী,' উপরে উক্ত, পৃ. ৫৬৬

১৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩), 'বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যচরিত' দ্রষ্টব্য। পৃ. ২৮-৪৮

১৬. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮), পৃ. ৩৫৬

১৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথি-২৩৫৩

১৮. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯. Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism In Bengal* (Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1985), P. 215 ; 'ভক্তিরত্নাকর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮

২০. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ৪৭৪২

২১. সুকুমার সেন, তদেব, পৃ. ২৯

২২. জয়নারায়ণ ঘোষাল, 'করুণানিধান বিলাস' (আখ্যাপত্রবিহীন ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-ভবনে মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকাতে সংখ্যা ৯০), পৃ. ২৪৭

২৩. অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' (কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮), পৃ. ৮১। প্রায় একই ধরনের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ২য় খণ্ড, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত (কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৭) পৃ. ৩১২

২৪. তদেব।

২৫. তদেব, ৮৮-৮৯

২৬. তদেব।

২৭. তদেব, পৃ. ৮১

২৮. শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার, 'জীবনীকোষ' (ঐতিহাসিক) ৫ খণ্ড প্রকাশিত (কলিকাতা, দেবব্রত চক্রবর্তী, ১৯৪১), ১, পৃ. ৮

২৯. তদেব, ২, পৃ. ৪০৪

৩০. উদ্ধবচন্দ্রের মৃত্যুকাল ১৯১৩ : তদেব, ১, পৃ. ৩৭২

৩১. সুবলচন্দ্র মিত্র, 'সরল বাঙলা অভিধান' (কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৭৩), পৃ. ১২৪০

৩২. 'জীবনী কোষ', ৪, পৃ. ৪

৩৩. জয়গোপালের তারিখ ১৮২৯-১৯১৬ ; তদেব, ৩, পৃ. ৬২৫-৬২৬

৩৪. 'সরল বাঙলা অভিধান', পৃ. ১০৩১

৩৫. দ্রষ্টব্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'আদর জানাই' (কলিকাতা, বিনোদ কিশোর গোস্বামী, সুকুমার দাস, তারিখ নেই) এটি প্রাণকিশোর গোস্বামী সম্বর্ধনা গ্রন্থ।

৩৬. 'সরল বাঙলা অভিধান', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৩৭. দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, 'বাঙ্গালীর গান' [কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১২] পৃ. ৮৬২ ; 'জীবনীকোষ', ২, পৃ.১৫১ ; কৃষ্ণকান্তের সময় ১৮২১-১৮৯১

৩৮. Dinesh Chandra Sen, *History* of *Bengali Language and Litreture* (Calcutta, University of Calcutta, 1911), PP. 585-588

৩৯. তদেব।

৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় সং ১৩৬৯), পৃ. ৪০৬

৪১. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালীর গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৬০ ; মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' (কলিকাতা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৭৩), পৃ. ৩৩ ; গোপেশচন্দ্র দত্ত, 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' (কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬), পৃ. ৭৬-৭৭

৪২. দ্রষ্টব্য : হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'দাশরথী রায়ের পাঁচালী', [কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২]

৪৩. দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (কলিকাতা, জিজ্ঞাসা) পৃ. ১৮১-১৮২

৪৪. অনুরূপা দেবী, 'মন্ত্রশক্তি' (কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ৭ম সং, তারিখ নেই) পৃ. ৬৬-৭১

৪৪ক. এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিক্রমপুরের অন্য এক গায়কের নাম উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তিনি মূলচর গ্রামের রাজকুমার ভট্টাচার্য। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন : "বর্ষার শেষে পূজার সময় তিনি নানা স্থানে যাইতেন—বড় জমিদার, মহাজন ও ধনীদের বাড়ী বার্ষিকী আদায় করিতে···তিনি ছিলেন দিব্য দেহ গৌরকান্তি সুপুরুষ···নিধুবাবুর টপ্পা গাহিতেন···দক্ষ শিল্পীর মত তিনি বেহালা, তানপুরা, এস্রাজ, ঢোল, পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি বাজাইতেন···ঢাকার সাহা-সম্প্রদায়, বালিয়াটি, শ্রীনগর, ভাওয়াল, রোয়াইল, মুরাপাড়া, এমন কি নবাব বাড়ীর কোন কোন মজলিশেও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। সর্বত্র খুব সমাদর···উপহার পাইতেন শাল, কাপড়, অর্থ।" শেষকালে অবিবাহিত এই গুণী যুবকের সঙ্গে একটি 'পুরী' প্রেমে পড়েন। রাজকুমারও এই পরীর প্রেমে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়ে, পরীকে শেষ পর্যন্ত না পেয়ে, কেবলই

বলতেন : "পাইয়া হারাইলাম!" উর্বশী হরুরবার সুপ্রাচীন কাহিনী এই জীবনবান গায়কের জীবনে যেন মূর্ত হয়ে উঠল ; রাজকুমার "স্বচক্ষে দেখা" ভৌতিক কাহিনী সংকলনে আসর জমিয়ে বসলেন। দ্রষ্টব্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'অঘটন যা দেখেছি', (কলকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, তারিখ নেই), "পরীর প্রেম" পৃ. ৩৮-৪৪

৪৪খ. কালীপাড়ার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, 'বিক্রমপুর', ২য় খণ্ড (নারায়ণগঞ্জ, দয়াময় চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৪), প্রথম অধ্যায় পৃ. ৪-৬৬

৪৫. কালীকৃষ্ণ শীল সম্পাদিত, 'গোপালভাঁড় রহস্য' [কলিকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, তারিখ নেই], পৃ. ৯২

৪৬. 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকা, ৫ জুলাই, পৃ. ৪ ॥ □